বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি চর্চায় সুন্দরবনের লোক-প্রযুক্তি

উজ্জ্বল সরদার

ভারতীয় সুন্দরবন পশ্চিমবঙ্গের একেবারে প্রান্তিক অঞ্চলে, বঙ্গোপসাগর উপকূলে। জল-জঙ্গল মানুষের সহাবস্থান এখানে। বসতি শুরুর সময় থেকেই মানুষ এখানে তার জীবনধারণের জন্যে প্রকৃতির ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আপাত হাতের কাছে পাওয়া উপাদান দিয়েই তারা নিজেদের মতো করে বহু জিনিসপত্র তৈরি করেছেন, যেখানে জটিল যান্ত্রিকতা নেই। আজও এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা সেভাবে সহজসাধ্য নয়। সুন্দরবনে স্থানীয় হাট-বাজারই মানুষের বিকিকিনির একমাত্র ভরসাস্থল, তাই খুব স্বাভাবিকই নিজস্ব উদ্ভাবনীতে আর গ্রামীণ জীবনের লৌকিক প্রযুক্তিতে শহুরে যান্ত্রিকতাকে দূরে রেখে এইসব অঞ্চলের মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজ চালানোর জন্য এতো অসাধারণ সব জিনিসপত্র বানিয়েছেন। উল্লেখ্য প্রতিটি জিনিসই স্থানীয় বাঁশ, গাছের ডালপালা, মাটি, খড়, গাছের পাতা এসব দিয়েই প্রস্তুত। ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের শুরুতে সুন্দরবনে যখন জঙ্গল কেটে বর্তমান বসতি গড়ে উঠছে তখন থেকেই মানুষ এখানে তার নিজস্ব চাহিদা মেটাতে থেকেছে প্রাকৃতিক লোকজীবনের মাধ্যমেই। বিশ্বব্যাপী বিশ্বায়নের এই দাপাদাপির যুগে আজও সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে লোক-প্রযুক্তির ছড়াছড়ি।

সুন্দরবনের ভৌগোলিক পরিবেশ যে এখানকার মানুষের জীবনের ওপর সব থেকে বেশি প্রভাব ফেলবে সেটাই স্বাভাবিক। বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি চর্চার দৃষ্টিতে যদি আমরা এই অঞ্চলের মানুষের ব্যবহার করা লোক-প্রযুক্তিগত দ্রব্যগুলির দিকে একটু নজর দিই তাহলে তা একটু হলেও চমকাতে হয় বৈকি। মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে, সহজলভ্য উপাদান দিয়ে নিজেদের গ্রামীণ প্রযুক্তিতে এতো যে জিনিসপত্র তৈরি করেছেন বা করছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। উল্লেখ্য এই চর্চায় গ্রন্থ নির্ভরতা যৎসামান্য, কিন্তু আজও সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে লোক-প্রযুক্তির অজস্র উপাদান ছড়িয়ে আছে যা সত্যই শিক্ষণীয়।

➲ ঘনি ও আঁটল : কৃষিকাজ আর মৎস্য শিকার এই দুটি প্রধান জীবিকা নির্ভর করেই সুন্দরবনের জনজীবন এগিয়ে চলছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই দুটি বিষয়ের জন্যে গ্রামের মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেদের জন্য প্রস্তুত করে নেন নিজেদের লোক-প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে। সমুদ্র, নদী, খাল বিল, পুকুরে মাছ ধরার জন্যে জালের ব্যবহার এসব অঞ্চলে

হয়। কিন্তু এসব বাদ দিয়েও সুন্দরবনের ধান জমির মাঠে বহু ছোটো ছোটো মাছ পাওয়া যায়, যা ধরার জন্য ঘনি আঁটল নামের একধরনের ফাঁদ ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনের গ্রামে কোথাও এটি বাঁকি, কোথাও এটি মুগ্রি নামে পরিচিত। ঘনি বা ঘুনি সাধারণত ছোটো আকৃতির হয় আর আঁটল তুলনায় অনেক বড়ো আকৃতির হয়। বাঁশের চেরা অংশ, মাছ ধরার মোটা সুতো, জাল এসব দিয়ে এগুলি তৈরি হয়। খাল-বিল-পুকুরের জলের স্রোতের মুখে আঁটলকে আর ধান ক্ষেত্রের জলের স্রোতের মুখে ঘনিকে বসিয়ে দিলে মাছ আপনা-আপনি এর মধ্যে প্রবেশ করলেও আর তারপর ঘুরে বাইরে বের হতে পারে না। এগুলি আগে সুন্দরবনের বহু মানুষ নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী বানিয়ে নিলেও আজকের প্রজন্ম এগুলি প্রস্তুতির পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। ফলে আজকের সুন্দরবনের বহু হাটে-বাজারে এগুলি কিনতে পাওয়া যায়, যা তৈরি করে সুন্দরবনের নির্দিষ্ট কিছু মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহ করছেন।

➲ **রিং জাল** : সুন্দরবন জল-জঙ্গালের স্থান, ফলে এখানে মাছের আধিক্য সবসময়েই। প্রয়োজন অনুযায়ী হাঁটু জলে বা কোমর পরিমাণ জলে নেমে দু-হাত দিয়ে জাল কাটিয়ে কাটিয়ে মাছ ধরা হয় যে জাল দিয়ে তাকে রিং জাল বলা হয়। একটি বাঁশের চেরাকে গোলাকৃতির রিং করে মাছ ধরার জাল সেটির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়, আর ওই জালের অপর প্রান্ত এক মুঠির মধ্যে নিয়ে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। এসব অঞ্চলে এই ছোটো জালকে কোথাও ছেগিন জাল, কোথাও আবার চাক জালও বলা হয়। সাধারণত পুকুর, খাল, মাঠের জলের মধ্যে নেমে এই জাল দিয়ে মাছ ধরা হয়।

➲ **যাঁতা** : সুন্দরবন অঞ্চলের কিছু কিছু গ্রামে অড়হর, মুগডাল প্রভৃতি চাষ হয়ে থাকে। সাধারণত ফসল হিসেবে ডাল বাড়িতে বা খামারে চলে এলে তারপর ডালের খোসা ছাড়ানোর জন্য যাঁতা জরুরী। এটি সভ্যতার প্রাচীন উপাদানের অন্যতম চিহ্ন বহন করছে। দুটি ভীষণ ভারী ভারী পাথরের চাকার মাঝে একটি ছিদ্র ও ওপরের চাকাটির প্রান্তে একটি পূর্ণাঙ্গ ও একটি অর্ধেক ছিদ্র থাকা জরুরি। মাঝের ছিদ্রের সঙ্গে দুটি চাকা যুক্ত থাকে আর ওপরে চাকার প্রান্তের পূর্ণাঙ্গ ছিদ্র দিয়ে ডাল মুঠো মুঠো করে দিয়ে অর্ধ ছিদ্রটির ওপর শক্ত লাঠি দিয়ে ঘোরালে ডাল ভাঙা হয়ে যায়।

➲ **উড়কি মালা** : বেশ প্রাচীন লোক-প্রযুক্তির রান্নার সরঞ্জামের মধ্যে একটি লুপ্তপ্রায় উপাদান এই উড়কি মালা। সুন্দরবনে অঞ্চলভেদে এটি ডাল ঘুটনি নামেও পরিচিত। একটি বাঁশের কঞ্চির ডগায় নারকেলের মালার দুই ধার ছিদ্র করে এপাশে ওপাশে বরাবর ঢুকিয়ে দিয়ে অনেকটা চামচের মত রূপ দেওয়া হয়। মূলত গৃহস্থ রান্নাঘরে ডাল জাতীয় খাদ্য রান্নার জন্যে ও পরিবেশনের জন্যে এই সরঞ্জামটি বিশেষ কাজের সহায়ক। স্থানীয় সহজলভ্য উপাদান দিয়ে দরকারি এই জিনিসটি সহজেই গ্রামে প্রস্তুত করা যেত। অতীতে একটা সময় সুন্দরবন তথা গ্রাম বাংলার দক্ষিণবঙ্গের ঘরে ঘরে এটি বহুল প্রচলিত হলেও আজ স্টিল, প্লাস্টিকের বহুল ব্যবহারে এটি একেবারেই হারিয়ে গিয়েছে বলা যায়।

➲ **মই** : সাধারণ মাটির সমতল থেকে উঁচুতে ওঠা, চাষের জমি প্রস্তুতের জন্যে লাঙ্গল দিয়ে জমি চষে দেওয়ার পর মাটির ঢেলাকে সমান করার জন্যও মই-এর প্রয়োজন। শক্তপোক্ত একটি বাঁশকে লম্বালম্বি চিরে দুটি খণ্ড করে বা গোটা দুটি বাঁশকে সমান্তরালে রেখে নির্দিষ্ট ফাঁক ফাঁক মাপের দুটি বাঁশে একই জায়গায় ছিদ্র করে সেখানে ছোটো ছোটো বাঁশের শক্ত

টুকরো ঢুকিয়ে দিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে বা জমাট করে দিলেই মই প্রস্তুত হয়ে যায়। সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির বাড়ি, আর এসব করতে গেলে মই-এর প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক। কিছু কিছু অঞ্চলে পৌষ সংক্রান্তির সময়ে এই মই-কেই দেবতা রূপে পুজোও করা হয়।

➲ **দে কাঠি** : সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে পাট কাঠি, গোবুর গোবর, ধানের তুঁষ সহজেই মেলে। গোয়ালে বা ঘরে মশা-মাছির উপদ্রব কমাতে অনেক সময় একটি মালসায় তুঁষের আগুন সবসময়ই জ্বালিয়ে রাখা হয়। আর শুকনো কাঠির অগ্রভাগ থেকে পাঁচ-ছয় ইঞ্চি লম্বা অংশ সংগ্রহ করে, সেই ফাঁপা লম্বা পাট কাঠির টুকরো নোড়া দিয়ে ফাটিয়ে আবার কয়েক টুকরো ভাগে বিভক্ত করতে হবে। এমনই ভাবে এক দু-গোছা পাট কাঠি নিয়ে দে কাঠি বানাতে হবে।[১] এই দে কাঠিতে গন্ধকদ্রব্য মিশিয়ে রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী মালসার আগুনে ঠেকিয়ে নিলেই তা দেশলাই-এর মতোই কাজে দেয়।

➲ **চুবড়ি** : বাঁশের চেরা বা কঞ্চি একেবারে সরু সরু করে নিয়ে ঠাস বুনটে গৃহস্থ বাড়ির দৈনন্দিন কাজে মাছ আনাজ ধোয়া, কিছু রাখা, খাবার ঢাকা দেওয়ায় জন্য এসব অঞ্চলে চুবড়ি ব্যবহার করা হয়। এগুলি সাধারণত গ্রামের নিম্নস্তরের প্রান্তিক মানুষজনই প্রস্তুত করে। গোলাকৃতির পাত্রের মতো দেখতে হয় এটি। স্টিল, প্লাস্টিক বাসনের দাপাদাপিতে আজও সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে চুবড়ির বহুল ব্যবহার প্রচলিত। এসব অঞ্চলে এটি 'ঠ্যাকা' নামে পরিচিত।

➲ **ঝোড়া ও ঝাঁকা** : বাঁশের চেরা সরু সরু করে মসৃণ ভাবে চেঁছে-ছুলে চুবড়ির থেকে বড়ো আকারের পাত্র আকৃতির ঝোড়া ও ঝাঁকা বানানো হয়। গ্রামের বহুবিধ কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় এটি। ঝোড়া সাধারাণত গোলাকৃতির হয় আর ঝাঁকা চ্যাপ্টা গোলাকৃতির। ঝোড়া সুন্দরবনের গ্রাম্যজীবনের দৈনন্দিন কাজে মাটি কাটা, কৃষিকাজ, পশুপালন, বড়ো সামাজিক অনুষ্ঠান, উৎসব পুজো, এসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর ঝাঁকা কৃষিজ ফসল, শাক-সব্জি, ফলমূল এসব রাখার জন্য বা বহনের জন্য বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির মানুষরা এগুলি তৈরি করেন। সুন্দরবনের প্রায় সকল গ্রামে এগুলির ব্যবহার আজও ব্যাপকভাবে চোখে পড়ে।

➲ **মুগুর** : মুগুর উচ্চারণ করলেই সকলের সামনে শরীরচর্চার পেল্লাই পেল্লাই সব মুগুর ভাঁজার ছবি সামনে ফুটে ওঠে। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবনের গ্রামে সাধারণত গোরু, ছাগলের খোঁটাকে মাটিতে পুঁতে দিতে বা একইরকমের বাঁশ, লাঠি এসব মাটিতে পোঁতার জন্য তার মাথায় সজোরে আঘাত করতে মুগুর ব্যবহার করা হয়। প্রমাণ মাপের বাঁশ, কাঠকে চেঁছে-ছুলে মসৃণ বানিয়ে একটি প্রান্তে কিছুটা হাতলের মতো বানিয়ে স্থানীয়রা মুগুর তৈরি করেন। মুগুরের জন্য যে কাঠকে নেওয়া হয় তা ওজনে বেশ ভারী হওয়া আবশ্যক।

➲ **খোঁটা** : সুন্দরবনের গ্রামের প্রায় প্রতি ঘরে গোরু, ছাগল পোষার চল বিশেষভাবে নজরে আসে। গ্রামের মানুষ এই গোরু বা ছাগলকে মাঠে, গোয়ালে বেঁধে রাখার জন্য একটুকরো- দেড়-দুই ফুটের বাঁশের বা অন্যান্য গাছের ডালের অংশকে ব্যবহার করেন, যাকে স্থানীয় ভাবে খোঁটা বলে। এই ছোটো অথচ মোটা কাঠের, বাঁশের টুকরোটির এক প্রান্ত সরু থাকে যাতে সহজে মাটির মধ্যে পুঁতে দেওয়া যায়, অপর প্রান্ত একটু খাঁজ কাটা থাকে

যাতে গোরু- ছাগলের দড়ি পেঁচিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া যায়। উল্লেখ্য গৃহস্থ বাড়ির মহিলা পুরুষরাই নিজেদের প্রয়োজনে নিজেরাই খুব সহজে এটি তৈরি করে নেন, কোনও যান্ত্রিক জটিলতা ছাড়াই।

➲ **আলটা** : সুন্দরবন তথা দক্ষিণবঙ্গের কৃষিজীবী পরিবারে এই আলটার ব্যবহার খুবই দেখা যায়। দক্ষিণ প্রান্তিক সুন্দরবন অঞ্চলে এগুলি বিড়া বা বিড়ে নামেই পরিচিত। ধান গাছ থেকে ধান ঝেড়ে নেওয়ার পর ধানের গাছকে খড় বলে। এই খড় কয়েকগুচ্ছ নিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে দড়ির মতো করে তাকে গোলাকৃতি করা হয়। ভাতের হাঁড়ি বা ঐ জাতীয় জিনিস মাটির ওপর সমানভাবে বসানোর জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। বছরের সবসময় এটির ব্যবহার চালু থাকলেও বিশেষ করে পৌষ সংক্রান্তি, ভাদ্র মাসের অরন্ধন বা রান্না পূজা, দুর্গোৎসব এসব সময়ে এটির ব্যাপক চাহিদা অতীতে পরিলক্ষিত হতো। সুন্দরবনের প্রায় সমস্ত ঘরে ঘরে এটির চল একসময় থাকলেও বর্তমানে এটি প্রায় লুপ্ত বলা যায়।

➲ **তালপাতার শার্সি** : সুন্দরবনের মানুষ বর্ষাকালে আজও যখন ছাতা, বর্ষাতির পরিবর্তে সহজলভ্য তালপাতা দিয়ে শার্সি বানিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়। মূলত তাল গাছের কচি ডগাসহ পাতা কেটে নিয়ে রোদে শুকানোর পর তালপাতার আঁশের সুতো দিয়ে ঐ পাতাগুলি একটির সঙ্গে অপরটি বেঁধে বেঁধে দিলেই শার্সি হয়ে যায়। সুন্দরবনের কৃষক, জেলেরাই এটি বেশি ব্যবহার করেন।

➲ **চাটাই** : সুন্দরবনের মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারের মাটিতে বসার জন্যে আসনের পরিবর্তে চাটাই ব্যবহার করা হয়। তালপাতা বা খেঁজুর পাতা গাছ থেকে কাঁচা অবস্থায় কেটে, তার দুই ধার থেকে শক্ত কাঠিগুলি বের করে নেওয়া হয়। তারপর একটি পাতার ওপর আর একটি পাতা ঠাস বুনটে মাটিতে ফেলে আসনের মতো প্রস্তুত করে চারিদিক থেকে কানা বা ধার মুড়ে দিলেই চাটাই প্রস্তুত হয়ে যায়।

➲ **লাঙল** : সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে আজও দেখা যায় লাঙ্গালের ব্যবহারের। ফাল, ঈশ, জোয়াল, আটচাল, হেলোবাড়ি, পালাবাড়ি, মই এসব হলো লাঙলের অংশ। কৃষিজীবী পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভরসাযোগ্য উপাদান হলো এটি।

➲ **আগড়** : সুন্দরবন বা দক্ষিণবঙ্গে মাঠ থেকে ধান সাধারণত প্রথমে খামার নামে একটা বড়ো জায়গায় এসে জমা হয়। এরপর সেখানেই ধান গাছ থেকে ঝাড়াই বাছাই করে নিয়ে গোলা বা বস্তা ভর্তি করা হয়। এই ধান ঝাড়াই করার জন্য একাধিক মানুষ ধান গাছগুলিকে বাঁশের তৈরি চওড়া আয়তকার আগড়ের ওপর ক্রমাগত আঘাত করে। সুন্দরবনে আগড়কে অঞ্চলভেদে ধাবর, পাটা বা ধরাটও বলা হয়। ধান গাছের শীর্ষ প্রান্তে ধান হয়ে থাকে। গাছগুলির অপর প্রান্ত এক মুঠি করে ধরে আগড়ের ওপরে সজোরে আঘাত করলেই মাটিতে শুধু ধান ঝরে ঝরে জমা হতে থাকে, পরে তা সংগ্রহ করে নেওয়া হয়। এই আগড় প্রস্তুতের জন্য দুই প্রান্তে দুটি বাঁশ পাঁচ বা ছয় ফুট আয়তনের মাপে নিয়ে তার মাঝে মাঝে ছিদ্র করে অজস্র বাঁশের চেরা বা খণ্ড অংশ সেলাইয়ের মতো এফোঁড় ওফোঁড় করে ঠাস বুনটে ভরিয়ে তোলা হয়। উল্লেখ্য এক্ষেত্রে কোনও পেরেক বা পিন জাতীয় কোনো কিছুই ব্যবহার করা হয় না।

➲ **পাল্কি** : অতীতে একটা সময় গ্রাম বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো সুন্দরবনে পাল্কির ব্যবহার বহুল প্রচলিত ছিল। তবে আজও সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে বেশ কিছু অঞ্চলে পাল্কির চল প্রচলিত আছে। গ্রামের ছুতোর সম্প্রদায়ের হাতেই পাল্কি গড়ে উঠত। কাঠের চৌকো বাক্সের দুই প্রান্তে দুটি লম্বা হাতল থাকে যা বেহারা কাঁধ দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে উপযোগী। ডুলি, চৌদোলা, মাহাফা, শিবিকা, কাণ্ডি, ঝাল্লেদার, চৌপাট এসব নামে ও পাল্কি পরিচিত।[২] পূর্ববর্তী সময়ে সাধারণ যানবাহন গোত্রে এটি থাকলেও আজ সুন্দরবনের গ্রামে বিবাহ উপলক্ষ্যে বা ঠাকুর পুজোর জন্যই এটি শুধু ব্যবহার করা হয়। আধুনিক যন্ত্রচালিত যানবাহনের আধিক্য আর পাল্কিবাহক বেহারাদের অপ্রতুলতার জন্যই এটি বর্তমানে প্রায় লুপ্ত বলা যায়। এটি স্থানীয় লোক-প্রযুক্তিতেই গ্রামের মানুষের অন্যতম উপাদান ছিল বলা যায়।

➲ **ঢেঁকি** : গ্রাম-বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে ঢেঁকিরও বহুল প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। সিতন, পাছা, মুষল, শামা, আঁকশলী, পোয়া, গড়, ভানকি দড়ি, উসকো বাড়ি এসব হলো ঢেঁকির এক একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।[৩]

➲ **বেলছরি** : সুন্দরবনের গ্রামে নারকেল, তাল, খেঁজুর গাছের ছড়াছড়ি। নারকেল গাছের ডাব নারকেল সারা বছরভর মিললেও তাল, খেঁজুর গাছের রস মেলে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে। আপাতভাবে বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন না হলেও সময়ে সময়ে এইসব গাছের ওপরের দিকের পাতাগুলিকে ছাড়িয়ে দিয়ে গাছকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়। আর এইসব বড়ো বড়ো গাছে উঠে এই কাজগুলি করেন এসব অঞ্চলের বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষেরা। তাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের মধ্যে দা, কাটারি, দড়ির সঙ্গে বেলছরি নামে একটি লম্বা কাঠ থাকে, যা আদতে প্রতিনিয়ত দা কাটারিকে মসৃণ ধার দিতে প্রয়োজন। সুন্দরবনের কিছু অঞ্চলে এটি পাটা নামেও পরিচিত। একটি আনুমানিক ফুট দুই লম্বা ও আট-নয় ইঞ্চি মতো চওড়া। কুল, বেল, তেঁতুল কাঠের ওপর সাদা বালি আর জল অনবরত মিশিয়ে দা-কাটারিকে চেপে ঘষতে থাকলে তা তীক্ষ্ণধারে পরিণত হয়। তবে গৃহস্থ বাড়ির অন্যান্য সরঞ্জাম যেমন—বঁটি, কাস্তে, দা, কাটারিকেও মসৃণ ধার দিতে এই বেলছরি কাঠটি ব্যবহার করা হয়।

সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে এমন বহু লোক-প্রযুক্তির জিনিসপত্র আজও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এসব কিছুর অনন্য দৃষ্টান্ত। সুন্দরবনের সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতে কুলো, পালি, কুনকে, মাকু, তেলেডোঙা এসবের নামের তালিকা খুব কম না হলেও বিশ্বায়নের দুনিয়ায় যান্ত্রিক নগরায়নের চাপে এসব আজ লুপ্তপ্রায় ইতিহাসের উপাদান বলা যায়।

তথ্যের সন্ধানে

১. কৃষ্ণকিশোর মিদ্যা : 'বিলুপ্তির পথে লোক-প্রযুক্তি : দে-কাঠি ও লবণ প্রস্তুতি', 'নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র', "জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি-৪"; সম্পাদক—বিমলেন্দু হালদার, সোনারপুর, কলকাতা, দশম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৫

২. কালিচরণ কর্মকার : 'শিকড়ের খোঁজে', রোহিণী নন্দন, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৯, পৃ. ১২

৩. তুহিনময় ছাটুই : 'লোকায়তিক সমাজ সংস্কৃতিতে ঢেঁকি', দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকায়ত সংস্কৃতি, ড. বি. আর. আম্বেদকর স্মৃতি রক্ষা সমিতি, বারুইপুর, জানুয়ারি, ২০১১, পৃ. ২৩৯